২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে প্রাক্-বাজেট আলোচনা সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(barkatabul71@gmail.com)

ও

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(aynulku@gmail.com)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা: ৭ মার্চ ২০২৩/২২ ফাল্গুন ১৪২৯

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ভিত্তিনীতি: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবনা

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(barkatabul71@gmail.com)

ও

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(aynulku@gmail.com)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ঢাকা: ৭ মার্চ ২০২৩/২২ ফাল্গুন ১৪২৯

ভূমিকা

দেশের জন্য বিকল্প বাজেট (Alternative Budget) প্রণয়ন ও তা জাতির সামনে উপস্থাপন—এটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জন্য এখন নিয়মিত বার্ষিক কর্মকা- । বিকল্প বাজেট উপস্থাপনের এ সংস্কৃতি আমরা শুরু করেছি ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এবং এ পর্যন্ত পরপর মোট ৮টি অর্থবছরে আমরা তা সুসম্পন্ন করেছি ।

আমাদের উত্থাপিত বিকল্প বাজেটের ভিত্তি হলো—মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা; আর লক্ষ্য হলো—বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা ।

কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত আর সেই সাথে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা—এহেন অনিশ্চিত এক দুঃসময়ে এ বছরেও আমরা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে 'জাতীয় বিকল্প বাজেট' উত্থাপন করব । তবে আজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের নীতিগত বিষয়সমূহ" উত্থাপন করব, যার মধ্যে বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে আমন্ত্রণের মুখ্য বিষয় "জাতীয় রাজস্ব বাজেট" । কভিড-১৯ অতিমারি, ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় অভিঘাতগ্রস্ততার নিরিখে আমরা বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতি প্রস্তাব করতে চাই (যাকে বলা যায় proposal on fundamental principles of the upcoming budget) ।

কভিড-১৯-এর অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিতে মন্দা—অনিশ্চিত এ অবস্থায় আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে এখন সঠিক প্রশ্নটি হতে পারে এমন—মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 'শোভন সমাজ' (Decent Society) নির্মাণে দেশের বার্ষিক বাজেট কাঠামো কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত? আমরা মনে করি—বার্ষিক বাজেট হতে হবে এমন, যা আমাদের দেশে 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বা 'শোভন জীবনব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এবং একই সাথে ওই বাজেটকাঠামো দিয়েই বিচার হবে যে দেশ শোভন সমাজমুখী কি না? আমাদের বাজেটকে কাঠামোগতভাবে এমন হতে হবে, যার মৌলিক নীতিগত বিষয়াদি আগামীতে এমন একশিলা-দৃঢ়বদ্ধ হবে (monolithic অর্থে), যা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যভিত্তিক আমাদের জীবনব্যবস্থাকে নিরন্তর শোভনকরণ প্রক্রিয়াভুক্ত করবে । একই সাথে সামনের বাজেটটি কাঠামোগত বিন্যাসের নিরিখে নীতিগতভাবে হতে হবে সর্বজনীন

(universal অর্থে), যার সর্বজনীন অভীষ্ট হবে—সবুজ বিশ্বে জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি।

বাজেট প্রণয়নে ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা

বিশ্ব এখন একই সাথে তিনটি মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। এসব মহাবিপর্যয় থেকে আমরাও মুক্ত নই। প্রথম মহাবিপর্যয় হলো—বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, যা মুক্তবাজার কাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসাচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় হলো—কভিড-১৯ উদ্ভূত মহামারির অভিঘাত। আর তৃতীয় মহাবির্পযয় হলো—রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট অভিঘাত। এ ধরনের অবস্থায় স্বাভাবিক যৌক্তিক প্রশ্ন হলো, একই সাথে সংঘটিত **অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়—মহামন্দা, কভিড-১৯ মাহামারি এবং ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মহাবিপর্যয়** থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' বিনির্মাণে একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো (conceptual theoretical construct) কেমন হবে এবং সেটির ভিত্তিতে তা বিনির্মাণে জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত? উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের যেসব সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেই হবে, তা হলো: (১) পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক কাঠামোতে অনিবার্য বৈশ্বিক মহামন্দাসহ যুদ্ধ ও কভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ উত্তরণের পথনির্দেশে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের পারগতা/অপারগতা এবং 'নতুন একীভূত অর্থনীতিশাস্ত্রের' যৌক্তিকতা; (২) ভাইরাস মহামারি প্রকৃতি-উদ্ভূত হলেও কি তা হতে পারে না প্রকৃতিকে অতিশোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সিস্টেম-উদ্ভূত; হতে কি পারে না যে, ভাইরাস-মহামারি আসলে প্রকৃতিকে নির্বিচার অত্যাচার-উদ্ভূত, পুঁজিবাদী অন্যায্য-অন্যায় বিশ্বায়ন-উদ্ভূত? (৩) ইউরোপে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এ যুদ্ধ কত প্রলম্বিত হবে এবং তার বহুমাত্রিক নেতিবাচক অভিঘাত আমাদের ওপর কী ধরনের এবং কতকালব্যাপী প্রভাব ফেলবে? এসব নিয়ে আমাদের মূল কথা চার-মাত্রিক (তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)।

আমাদের প্রথম কথা/প্রথম মাত্রা: সব দোষ কভিড-১৯ ভাইরাসের—এটাই বলা হচ্ছে। আসলে এটা সত্য নয়। এটা আসল কথাও নয়। মূল কথা হলো এ রকম: রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোম্বি কর্পোরেশন-স্বজনতুষ্টিবাদী মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এমনই এক সিস্টেম, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যচক্রের (long-term business cycle) বিধান অনুযায়ী প্রতি ৩০-৪০ বছর পরপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি সিস্টেমে **মহামন্দা** (great depression; great slowdown; crisis) অবশ্যম্ভাবী। আর এ সূত্রানুয়ায়ী সেটা ঘটার কথা ২০১৯-২০ সালের দিকে। এবং

তাই-ই ঘটেছে—বিশ্বব্যপী। কিন্তু যে ঘটনা ইতিহাসে কখনও একই সাথে ঘটেনি—তা ঘটেছে এবার। আর তা হলো একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, অন্যদিকে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ সংক্রমণজনিত মহামারি (যার শেষ কোথায় তা এখনও অজ্ঞাত; অনিশ্চয়তাহেতু যার শেষ অভিঘাতও কারো জানা নেই)। আবার ইতিহাস সাক্ষী যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও সম্পর্কিত—কখনও কারণ হিসেবে, কখনও বা ফল হিসেবে। যুদ্ধটা এখন ইউরোপের রাশিয়া-ইউক্রেনে। এ যুদ্ধ কতকাল চলবে তা যেমন বড় প্রশ্ন, তেমনি বড় প্রশ্ন এ যুদ্ধ আরো বড় যুদ্ধের কারণ হতে যাচ্ছে কি-না? ইউরোপে বড় ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভাবনাও অসম্ভব নয়।

বিশ্বের দেশনির্বিশেষে সব দেশই এখন 'অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত-স্বাস্থ্যগত-রাজনৈতিক'—এই বহুমুখী মহাবিপর্যয়কর অবস্থায়—"মহামন্দা রোগে" (disease of great depression/horror disease) আক্রান্ত, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই-ই প্রথম। রুগি এখন ICU-তে (যেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না—কোথাও না, কোনো দেশেই না)। সুতরাং এই রুগিকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাকে সুস্থ করতে হবে। অর্থাৎ দেশের কথা বললে বলতে হয়—দেশের অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সরকার সবকিছুকেই সর্বপ্রথম প্রাক্-অসুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগের অবস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটপ্রণেতাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে ২০২৩ সালের এই মার্চ মাসে আমরা ২০২০ সালের মার্চ মাসের অবস্থায় নেই। যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তন হয়েছে—অর্থনীতিতে, সমাজে, মানুষের সাহস-হতাশায়, রাষ্ট্রে, সরকারে—সর্বত্র। অবশ্য এ স্বীকৃতিতেও যে খুব বেশি কিছু যায়-আসে, তা নয়। তবে এটা হবে নির্মোহ **সত্য অস্বীকার করা বা তা এড়িয়ে চলা**—'denial syndrome' থেকে মুক্তি। এ স্বীকৃতিতে খুব যায়-আসে না; কারণ, কভিড-১৯ এর পূর্বাবস্থাও সুখকর ছিল না—তা ছিল রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার পুঁজিবাদের অর্থনীতি—যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধবও নয়; যেখানে আয় বৈষম্য-ধনসম্পদ বৈষম্য-শিক্ষা বৈষম্য ও স্বাস্থ্য বৈষম্য ছিল ক্রমবর্ধমান। **সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পরের বাজেট আমরা বৈষম্যহীন আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে করব, নাকি মুক্তবাজার আর কর্পোরেট-স্বার্থীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বায়নের হাতে ছেড়ে দেব—এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অন্যথায় আমরা গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাব—জিডিপি বাড়লেও বাড়তে পারে; মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু নিরসন হবে না বৈষম্য-অসমতা এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য; হবে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা অভীষ্ট বাস্তবায়ন।**

আমাদের দ্বিতীয় কথা/দ্বিতীয় মাত্রা: আমাদের দ্বিতীয় কথা এ দেশে বৈষম্যসহ ধনী-দরিদ্রের প্রবণতা নিয়ে—বিত্তের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন নিয়ে। আর একই সাথে এই প্রবণতায় করোনাকালীন এবং পরবর্তী মন্দাকালীন-যুদ্ধকালীন অভিঘাত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ রকম:

(১) দেশের অধিকাংশ মানুষই বহুমাত্রিক দরিদ্র। আর ধনী (অথবা সুপার ধনী) হলেন জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ (হতে পারে ১ শতাংশেরও ভগ্নাংশ)। এ কথা অনস্বীকার্য এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে, করোনার লকডাউনের প্রভাবে 'নিরঙ্কুশ দরিদ্র' (absolute poor) মানুষ 'হতদরিদ্র-চরম দরিদ্র' (ultra poor) হয়েছেন; আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপকাংশ দরিদ্র হয়েছেন এবং মধ্য-মধ্যবিত্তদের একাংশ বিত্তের মানদণ্ডে নিম্নগামী হয়েছেন। ফলে এখন একদিকে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা করোনার সময়ের আগের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দরিদ্রগোষ্ঠী, যারা আগে দরিদ্র ছিলেন না—যাদের নাম 'নবদরিদ্র' (New Poor)। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিত্তের এই অধোগতি—আগে কখনও হয়নি—এ এক নতুন প্রবণতা। দারিদ্র্যের আরো একটা বিষয় এর আগে কখনও ঘটেনি—আর তা হলো দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যাপক হারে বাধ্য হয়ে শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া (urban to rural forced migration)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব মানুষের অনেকে গ্রামেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে বাধ্য হবেন।

(২) আর অন্যদিকে লকডাউনের কারণেই Off-line-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা ও সেবাখাতে অধোগতি হয়েছে—হয়েছে তা নিম্নগামী। আর ফুলেফেঁপে উঠেছে On-line ব্যবসা-বাণিজ্য (এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা—তা না-হলে আমাজনের বোজোস কী করে মাত্র ১ দিনে তার সম্পদে ১২ বিলিয়ন ডলার নবসংযোজন করতে পারলেন?)। On-line-এর রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীরা মুক্তবাজারে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে তাদের আয়-সম্পদ-সম্পত্তি বিপুল বাড়িয়েছে। এসবের ফলে আয় বৈষম্য (income inequality), সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality), শিক্ষা বৈষম্যসহ (education inequality)—বৈষম্যের সব ধরনই বেড়েছে। আমাদের

হিসাবে আমাদের দেশে আয় বৈষম্যের মাপকাঠি **গিনি সহগ**-এর মান লকডাউনের আগে ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের পরে মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (৩১ মে ২০২০ নাগাদ) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬৩৫-এ; আর **পালমা অনুপাত** (যা দেখায় একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক ১০ শতাংশ মানুষের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক ৪০ শতাংশ মানুষের মোট আয়ের কতগুণ বেশি)—একই সময়ে ২.৯২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৫৩ (যা বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের' দেশ-এ রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধিতে প্রভাবকের কাজ করছে। **এমতাবস্থায় বাজেটপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব হলো—সম্পদ-আয়-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে, তার সবই যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের চেষ্টা করা**।

আমাদের তৃতীয় কথা/তৃতীয় মাত্রা: মানুষের ক্ষুধার দারিদ্র্যসহ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আরো বাড়ছে-বাড়বে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা—মানুষের কর্মসংস্থানের। দেশে মোট শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৬ হাজার, যাদের ৮৫% অর্থাৎ ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে (informal sector) কর্মরত—যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত-শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ। বাস্তবতা হলো, কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনে এসব মানুষের অধিকাংশই হয় কর্মহীন অথবা স্বল্প মজুরিতে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িককালীন কর্মজীবী। কারণ, কর্মবাজার সংকুচিত হয়েছে। অনিশ্চয়তাহেতু (uncertainty) সম্ভবত সামনে আরো হবে—যদি সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। পরিবার-পরিজনসহ এসব মানুষের পক্ষে জীবন পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদের হাতে টাকা-পয়সা নেই; অনেকেই যা-কিছু ছিল তাও বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন ("দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে বিক্রি"-distress sale)—এরা এখন নিঃস্ব, সর্বস্বহারা, হতাশাগ্রস্ত, ভাগ্যনির্ভর। এসবের সাথে এখন যোগ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত। এসব মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে **ব্যাপক ও শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দার সময়ে নিউ ডিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

করে। এসবের একটা অর্থ হলো, বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণশীল—সংকোচনমূলক নয়।

আমাদের চতুর্থ কথা/চতুর্থ মাত্রা: অর্থনীতিবিদদের প্রায় সবাই বলে থাকেন, জিনিসপত্তরের দাম বাড়া বা **মূল্যস্ফীতি** (inflation) হলো গরিবের শত্রু। এ কথা মিথ্যা নয়। কারণ গত এক বছরে মূল্যস্ফীতি গরিব মানুষকে গরিবতর করেছে; আর মধ্যবিত্ত মানুষের অধোগতি দৃশ্যমান বাস্তবতা—এসব নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এসবই মানুষের জীবন-জীবিকায় অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে অনেক কথা হলেও যে কথা তেমন বলা হয় না, তা হলো—**মূল্যহ্রাস বা মূল্যসংকোচন** (deflation) হলো গরিবের মহাশত্রু। উল্লেখ্য, ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দাকালে মূল্যস্ফীতি ঘটেনি, ঘটেছিল মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচন; আর ওই মহামন্দার পরপরই 'মূল্যহ্রাস/মূল্যসংকোচনের' সুযোগে নির্বাচনের মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ট হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় বসে পড়েন। এসব গূঢ় বিষয় নিয়ে দূরদর্শী বাজেটপ্রণেতারা ভাববেন—এ প্রত্যাশা অমূলক হবে না।

আসন্ন বাজেটের ভিত্তি-নীতির ভিত্তিকথা নিয়ে যে চারটি বাস্তব বিষয়-প্রবণতা উল্লেখ করলাম, তা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে—মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার লক্ষ্যে **বাজেটপ্রণেতারা এবারের বাজেটে নিদেনপক্ষে দু'টো বড় মাপের বিষয় নিয়ে ভাববেন:**

প্রথম যা ভাবা প্রয়োজন: আয়-ধন-সম্পদের বণ্টন হতে হবে ন্যায্য—তা ধনীদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে হবে দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে। এ লক্ষ্যে বাজেট যা পারে, তা হলো: (১) ধনী-বিত্তশালীদের ওপর সম্পদ কর (wealth tax) আরোপ করা, (২) সুপার-ডুপার ধনীদের ওপর কর হার বাড়ানো, (৩) শেয়ারবাজার ও বন্ডবাজারে বড় বিনিয়োগের ওপর সম্পদ কর আরোপ করা (আসলে গুটিকয়েক ব্যক্তিই ৮০ শতাংশ শেয়ার-বন্ডের মালিক), (৪) অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ করা (tax on excess profit), (৫) কালোটাকা উদ্ধার করা, (৬) পাচারকৃত অর্থ (money laundering) উদ্ধার করা। এসবই আজকের আলোচ্য বিষয়—রাজস্ব বাজেটের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কর-জিডিপি (tax-GDP) অনুপাত বাড়াতে হবে—এ কথা সবাই বলেন। আমরাও তা মানি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো—কর-জিডিপি অনুপাতের বৃদ্ধিটা হতে হবে বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট, আর সে লক্ষ্যেই আমাদের উল্লিখিত ৬ সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

আমাদের প্রায়ই শোনানো হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উত্তরণ-রূপান্তরকালীন অর্থনীতি (Economy in transition and transformation) এবং এ সময়ে বৈষম্য বাড়াটা স্বাভাবিক, তবে তা সাময়িক কারণ; "চুইয়ে পড়া প্রভাবের" (trickle down effect) ফলে দীর্ঘ মেয়াদে বৈষম্য কমে যাবে। যেহেতু এসব তত্ত্বকথা ভ্রান্ত এবং বাস্তবে কখনও প্রমাণ হয়নি, সেহেতু আমরা মনে করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব কর্মকা- হতে হবে বৈষম্য-অসমতা-দারিদ্র্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট। রাজস্ব বাজেট ভাবনায় এসব অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

দ্বিতীয় যা ভাবা প্রয়োজনঃ সরকারিভাবেই শোভন মজুরির ব্যাপক কর্মসংস্থান-সুযোগ সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত টাকা ছাপালেও কোনো অসুবিধা হবে না (তবে 'ভারসাম্য' বিষয়টি নজরে রাখতে হবে, যেন অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো না-হয়)। অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আর বিশ্বব্যাংকের নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করলে এসব করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে 'New Deal' নীতির আওতায় ব্যাপক কর্মসংস্থান-এর যেমন কোনো বিকল্প ছিল না—এখনও তেমনি দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই (এখনকারটা হতে পারে 'Green New Deal'; প্রকৃতির প্রতি সম্মান ও আনুগত্যভিত্তিক 'নিউ ডিল')।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ—এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্ব মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনও একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধ ও মহামারি ঘটেনি। বাংলাদেশে আমরাও এসব মহাবিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত নই।

আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ২০২১ সালে '১৯৭১'-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী এবং ২০২২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করলাম। সমসাময়িক সময়েই কভিড-১৯ মহামারির লকডাউন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এসব কারণে আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র—সবকিছুই বিপর্যস্ত। এহেন দুঃসময়-মহাবিপর্যয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণভিত্তিক জন-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বাজেট দেশের আপামর মানুষ গ্রহণ করবেন—এ আশা অমূলক হবে না। বহুমাত্রিক বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে—আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন বাংলাদেশ' বিনির্মাণ—যা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এ বিশ্বাসও অমূলক হবে না যে, করোনা-বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-যুদ্ধ—বহুমাত্রিক এসব বিপর্যয় মানুষের (আমাদের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে দুর্বল করবে না, উল্টো এ বিপর্যয় কাঙ্ক্ষিত মানবিক উন্নয়ন-প্রগতির গতি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের লক্ষ্য হতে

হবে—সেই সুযোগ উদ্‌ঘাটন-অনুসন্ধান করা এবং তা দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো। আমরা জানি, এসব এক বাজেটের কাজ নয়।

বাজেটসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ধার করা নয়; অথবা (আমাদের ওপর) বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেয়া নয়—"প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও আস্থাভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন"ই সঠিক পথ বলে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, তাই-ই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি—মুক্তিযুদ্ধের শুভ চেতনায় সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব—যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক—সব বিচারেই তা সম্ভব। সম্ভব এ দেশের দ্রুত কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ সৃষ্টি। আমরা এটিও বিশ্বাস করি—করোনা-১৯ এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এসব বহুমাত্রিক বিপর্যয় সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমগ্র দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হলো, সেসবের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যেসব বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' ওপর জোর দেবার এবং অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা হলো নিম্নরূপ:

(১) **সাংবিধানিক ভিত্তি:** বাজেট প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন—সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক—এ ধরনের সবকিছু বাজেট প্রণয়নে বর্জন করতেই হবে। 'সচেতনবর্জিত' বিষয়াদি হতে হবে সংবিধানের ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"র সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা নিম্নরূপ:

> "৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।
>
> (২) জণগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত

> অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১), (২)]

(২) **রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয় বরাদ্দ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মহাবিপর্যয়কর আঘাতসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট মোকাবিলা এবং একই সাথে প্রাকৃতিক যুক্তির বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমূলক।

আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে নব্য-উদারবাদীরা মানুষের জীবন ও জীবিকার মৌল ক্ষেত্রসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেবার কথা এখন আরো জোর দিয়ে বলবেন। তাদের অনেকেই এখন বলছেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মহামন্দামুখী; বলছেন, বাজারকে তার কাজ করতে বাধা দেয়া হয়েছে বলেই মহাবিপর্যয় হচ্ছে এবং হবে; বলছেন, পুঁজিবাদ যথেষ্ট মাত্রায় নেই দেখেই যত সমস্যা; বলছেন, "সরকারই হলো সমস্যার মূলে"; বলছেন, সমাজ (society) বলে কিছু নেই; বলছেন, সরকারের এখন উচিত হবে যেখানে যত অর্থকড়ি আছে, তার সবই ব্যক্তিমালিকদের দিয়ে দেয়া—তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধনী দেশের যারা এসব প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তারা কিন্তু সম্ভাব্য সবধরনের সংরক্ষণবাদ নীতি (protectionist policy) অবলম্বন করেই ধনী হয়েছেন; তবে ধনী হওয়ার পরে "উপরে ওঠার মইটি লাথি মেরে সরিয়ে" (kicked away the ladder) মুক্তবাজারে আমাদের খেলতে বলছেন। এসবই হলো দ্বিচারিতা (hypocrisy)।

(৩) **দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত:** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি—যেসব খাত দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে; যেসব খাতের বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি

সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক (long term social positive impact); যেসব খাতের বরাদ্দ কৃষির বিকাশ, দেশজ শিল্পায়ন, অভ্যন্তরীণ বাজার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে; যেসব খাতের বরাদ্দ প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি সম্মানসহায়ক; যেসব খাতের বরাদ্দ মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহায়ক।

(৪) **কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন-ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা:** কভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গবেষণা-উদ্ভূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে থাকতে হবে।

(৫) **আয় ও ব্যয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:** সঙ্গত কারণেই বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা জরুরি। এ বিবেচনার ভিত্তি হবে সংবিধানের ভিত্তিতে 'শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ'।

(৬) **বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:** কোনো ধরনের বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব। এ অনুসিদ্ধান্তের মূল কারণ দ্বিবিধ—আমরা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বৈদেশিক ঋণ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার মতবাদতাড়িত, যা স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তবে বিদ্যমান রেন্টসিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্ত ডাকিনীবিদ্যক পুঁজি ও কর্পোরেশনবেষ্টিত (যাকে বলে Zombie corporation) রাজনীতি-অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সরকার তুলনামূলক কম বিষাক্ত (less toxic) বৈদেশিক ঋণ নিলেও নিতে পারেন (বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা হতে পারে প্রয়োজনীয় আপোসমূলক অবস্থান)।

(৭) **রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিত্তবান-ধনীদের ওপর যুক্তিসঙ্গত চাপ প্রয়োগ:** করোনা-উদ্ভূত বিপর্যয়কর পরিস্থিতিসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাজেটের জন্য সম্পদ আহরণ ও বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যেমন দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যমধ্যবিত্তদের আমরা কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ সমীচীন মনে করি না। আমরা

মনে করি, চাপ প্রয়োগ দরকার ধনিক শ্রেণি-সম্পদশালীদের ওপর। ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান—যারা সম্পদ, আয় এবং মুনাফার অর্থমূল্য কম প্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক কর প্রদান করেন না—তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন, তা শক্তভাবে নিশ্চিত করা জরুরি। একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ জরুরি।

(৮) **পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যমধ্যবিত্তদের ওপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে; ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস করে না—উল্টো তা বৈষম্য বাড়ায়। সে কারণে আমরা মনে করি, পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৯) **কোনো আয়ই আসে না, অথচ সম্ভাবনা অনেক:** কর-রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে আয়করের কথা কখনও ভাবা হয় না (যেমন সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, কালোটাকা উদ্ধার, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ইত্যাদি) এবং যেসব খাত থেকে কোনো আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে—অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক, যদি একটু সাহসী ও উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়।

(১০) **উন্নয়নদর্শন ও কভিড-১৯-বৈশ্বিক মন্দা—রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত মোকাবিলার কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:** 'শোভন জীবনব্যবস্থা' নিশ্চিতকরণে যে উন্নয়নদর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি, সে কারণেই বাজেট বরাদ্দে আমাদের অগ্রাধিকারক্রম হওয়া উচিত হবে নিম্নরূপ: শিক্ষা ও প্রযুক্তি ('শিক্ষা'কে আমরা প্রযুক্তি থেকে ভিন্ন করে শিক্ষা খাতে "শিক্ষা ও গবেষণা" নাম দিয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার পক্ষে), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, জনপ্রশাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য (কৃষির সমান গুরুত্ব), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ (জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সমান গুরুত্ব), সুদ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম (সংস্কৃতি ও ধর্মকে আমরা একবন্ধনী খাত থেকে দুটি ভিন্ন খাত হিসেবে প্রস্তাব

করছি), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিবিধ ব্যয় (খাদ্য হিসাবসহ)।

(১১) **দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ সংযোজন:** জাতীয় স্বার্থে বাজেটের সম্পদ ব্যবহারে গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা দুটি নতুন মন্ত্রণালয় ও ১৬টি নতুন বিভাগ প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়দ্বয় হলো: (১) গণপরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Transport) এবং (২) গবেষণা, উদ্ভাবন, বিচ্ছুরণ, ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Research, Innovation, Diffusion, and Development Ministry)। আর বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত ১৬টি নতুন বিভাগ (New Division/ Directorate) হলো নিম্নরূপ: **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১) প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ, (২) দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৩) নারীর ক্ষমতায়ন বিভাগ (গ্রাম ও শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও নারীপ্রধান খানা), (৪) আদিবাসী মানুষের জীবনকুশলতা উন্নয়ন বিভাগ, (৫) শিশুবিকাশ বিভাগ, (৬) বিধিবদ্ধ রেশনিং বিভাগ (দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য), (৭) সার্বজনীন পেনশন বিভাগ, (৮) দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন বিভাগ; **স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** (৯) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ; **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১০) নারীর বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, (১১) কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, (১২) মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; **কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৩) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ, (১৪) হাওর-বাঁওর-বিল-চর উন্নয়ন বিভাগ; **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৫) অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ; **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন** (১৬) অণু ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ।

এ ছাড়া যদিও আমরা গত বছরের বিকল্প বাজেটে প্রস্তাব করিনি, তথাপি মনে করি দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত মন্ত্রণালয় (Ministry of Informamal Sector) গঠন করা উচিত। কারণ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। একইসাথে শক্তিশালী **কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিভাগ** গঠনের পাশাপাশি গত বছরের বিকল্প বাজেটে আমরা প্রস্তাব করেছি যে বর্তমান **ভূমি মন্ত্রণালয়ের** নাম বঙ্গবন্ধু প্রদেয় **ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়**-এ পরিবর্তন করা; পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত

করে **আদিবাসী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয়** গঠন করা, যার দু'টো বিভাগ হবে পার্বত্য আদিবাসী বিভাগ এবং সমতলের আদিবাসী বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর পল্লী উন্নয়ন এবং গণমুখী-বহুমুখী সমবায় বিভাগ গড়ে তোলা (যার প্রতিটিতেই একজন করে ভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন); শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন **শিল্প সুরক্ষা/সংরক্ষণ বিভাগ** (Industry Protection Division) গড়ে তোলা; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে **বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ** গঠন করা; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শক্তিশালী কার্যকর **নদী খনন বিভাগ** প্রতিষ্ঠা করা।

(১২) **মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন:** মানব উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরসহ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী (কৃষকের শস্যবীমা ও ভূমি সংস্কারসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম), কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ, গৃহায়ণ, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ-এর বরাদ্দে আমরা যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করছি।

(১৩) **আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:** আমদানি শুল্ক হার নির্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ নীতি-দর্শন প্রয়োগের সুপারিশ করছি।

(১৪) **প্রকৃত মানবিক উন্নয়নের অন্যতম পথনির্দেশক দলিল:** আসন্ন বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্ভাব্য অর্জনমাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন: (ক) প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সম্মান বজায় রেখে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় যেন বৈষম্য হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে, (খ) সমাজের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া মানুষের সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, (গ) বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (ঘ) অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি, (ঙ) অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, (চ) শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (আত্মকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের

মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব, (ছ) অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমজীবী মানুষের উন্নত জীবনমান এবং শোভন কাজ, (জ) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার, (ঝ) নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন, (ঞ) বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, (ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার, (ঠ) সরকারি খাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকা- ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর, (ড) প্রাথমিক ও উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা (জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবাসহ) নিশ্চিতকরণে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত, এবং (ড়) সবধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, সামাজিক সুরক্ষার ভিত সুপ্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত করার লক্ষ্যে আমরা গত বছরের বিকল্প বাজেটে **"সার্বজনীন পেনশন"** ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সরকার ইতিমধ্যে "সার্বজনীন পেনশন" চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন—এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।

কভিড-১৯-এর মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—বহুমাত্রিক এসব মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি এবং একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিগত ভিত্তি-ভাবনা প্রয়োগে আমরা মনে করি—আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট হওয়া উচিত সম্প্রসারণশীল, কোনোভাবেই সংকোচনমূলক নয়। আমাদের প্রস্তাব বৈষম্য হ্রাসকারী বৃহদাকার-সম্প্রসারণশীল বাজেট। আমরা মনে করি, বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট সম্প্রসারণশীল বাজেটই হতে পারে সুসংহত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের যুক্তিসিদ্ধ পথ। আমরা আশা করি, যুক্তি থাকলে সরকার আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ, অর্থনৈতিক মহামন্দা, কভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট বিপর্যয়কর অভিঘাত মোকাবিলা করে আমরা আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন 'শোভন সমাজব্যবস্থা' বিনির্মাণের পক্ষে।

আমাদের শেষ কথা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য গত বছর আমরা যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করেছিলাম, তার শিরোনাম ছিল **"জনগণতান্ত্রিক বাজেট"**।[১] কারণ মর্মগতভাবে তা ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌল বিধানের ভিত্তিতে প্রণীত মৌলিক রূপান্তরমুখী অর্থনৈতিক দলিল। আমরা মনে করি আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট এ জন্য প্রয়োজন যে কাঠামোগত বিচারে একমাত্র এ প্রকৃতির বাজেটই পারে বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা-বহুমুখী দারিদ্র্য থেকে জনগণের উত্তরণ ঘটাতে। অন্য কোনো ধরনের বাজেট দিয়ে এই কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ-রূপান্তর (transition and transformation) সম্ভব নয়। আমরা এও মনে করি যে— আমাদের প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বাজেট ধারণা বাস্তবায়ন করলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেই একদিকে একইসাথে অতিবিপজ্জনক বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব, অন্যদিকে একইসাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থান থেকে মধ্যমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানে উত্তরণ-রূপান্তর সম্ভব। এটাই হতে পারে ২০৩১ সাল নাগাদ স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের বাংলাদেশে উত্তরণ-রূপান্তরের কাঙ্ক্ষিত বাজেটীয় পথ। আর এটাই জনগণতান্ত্রিক বাজেটের মূল উদ্দিষ্ট-অভীষ্ট ও অন্তর্নিহিত শক্তি।

[১] দেখুন, আবুল বারকাত (২২ মে ২০২২), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা ২০২২-২৩: একটি জনগণতান্ত্রিক বাজেট। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

* বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই দলিল প্রণয়নে যেসব সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম: বিভিন্ন সময়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট (২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত); বারকাত, আবুল (২০২০), "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" (ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
কার্যনির্বাহক কমিটি ২০২২-২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	এ জেড এম সালেহ্
যুগ্ম-সম্পাদক	:	বদরুল মুনির শেখ আলী আহমেদ টুটুল
সহ-সম্পাদক	:	পার্থ সারথী ঘোষ মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন মোঃ হাবিবুল ইসলাম

সদস্য : ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী
অধ্যাপক শাহানারা বেগম
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম
মোঃ মোজাম্মেল হক
ড. শাহেদ আহমেদ
মেহেরুননেছা
খোরশেদুল আলম কাদেরী
নেছার আহমেদ
মোহাম্মদ আকবর কবীর
মোঃ আখতারুজ্জামান খান

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২৫৯৯৬
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬

ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org